ভূমিকা

উনিশ শতকের ইতিহাস বাঙালির ইতিহাসে এমন এক কাল যা আধুনিক নবজাগরণে ঋদ্ধ বাঙালির ভিত্তি নির্মাণের সময়। অষ্টাদশ শতকে সাধারণতঃ মধ্যযুগের শেষ সীমা ধরা হয় অষ্টাদশ শতকেই ছাপাখানা বা মুদ্রাযন্ত্র এসে বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাঙালিকে যুক্ত করা আরম্ভ করেছিল। যদিও ষোড়শ শতকের প্রত্যুষেই বাংলায় ইউরোপীয় বণিকদের আগমন হয়েছিল কিন্তু মোগল যুগের প্রথম দুই শত বৎসরের মধ্যে বাংলার তথা বাঙালির মননকেন্দ্রে এরা কোনো আঘাত হানতে পারেনি। মোগল যুগ শুরু হবার সময় সমগ্র বাংলাদেশে নেমে এসেছিল রাজনৈতিক অশান্তির করাল ছায়া। যদিও বৈষ্ণব ধর্মের চূড়ান্ত প্রতিপত্তির কালে অক্ষুণ্ণ ছিল। মোগল শাসন বাংলায় স্থায়ীভাবে লাগু হলেও বাংলার আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে বদল আসে। সমৃদ্ধির আলোকে উদ্ভাসিত মধ্যযুগের এই অংশে বাংলায় সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা তার চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠেছিল। সপ্তদশ শতকের শুরুতে কাশীরাম দাসের আবির্ভাব যিনি শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন কৃত সংস্কৃত মহাভারতের ভাবানুবাদ নিয়ে বাংলায় প্রথম অষ্টাদশ পর্ববাপী মহাভারত রচনা করেন যার দরুন তিনি অনুবাদ সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই সমৃদ্ধির চূড়া জনপ্রিয়তার চরম পর্যায়ে উন্নীত করতে পেরেছিলেন।

কবি কৃত্তিবাসের ধারাতেই এই অনুবাদের ধারার সূত্রপাত। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের বিষয়বস্তুকে শিক্ষিত বাঙালি সমাজ তুলে দিতে চেয়েছিলেন সাধারণ দেশীয় ভাষায় পারঙ্গম লোক সমাজের হাতে। রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদের প্রথম প্রয়োজনীয়তা এখানেই। অনুবাদ সাহিত্যগুলি চতুর্দশ শতক থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে রচিত হয়ে গেছে। মূলত বাংলা সাহিত্যের মঙ্গলকাব্য বা বৈষ্ণবকীর্তন গান বা শাক্ত গানের ধারায় এবং রোমান্টিক আখ্যান বা লোক সাহিত্য এমন এক ধারা কৃত্তিবাসী রামায়ণ বা মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য থেকে উনিশ শতকের কোচবিহার রাজ্যসভার রামায়ণ ও মহাভারত অনুবাদ পর্যন্ত এক সুদীর্ঘ ইতিহাস রচনা করেছে। আসলে রামায়ণ ও মহাভারত এমন এক ইতিহাস যা ভারতবর্ষের মানুষ আজও না পড়েই জেনে যায়। এই না পড়ে জানার জন্য যে স্তরে স্তরে সোপানগুলির প্রয়োজন হয় মূল আদি মহাকাব্য থেকে ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্য হয়ে আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলিতে অনুবাদই হল তার যশস্কর সোপানশক্তি। মধ্যযুগের বাংলায় ভক্তিবাদী গণজাগরণের সঙ্গে এই উদ্ভাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। অনুবাদ সাহিত্য সেই দিক দিয়ে মধ্যযুগে

সাফল্যের সঙ্গে প্রাচীনকে নবীনের কাছে পৌঁছতে দেবার গুরু দায়িত্ব পালন করেছে।

অষ্টাদশ শতকের একেবারে শুরুতে মোগল বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর থেকে দিল্লীর কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে। বাংলাতেও বিদ্রোহ, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব দেখা দেয় মুর্শিদকুলি খাঁ নবাব নাজিম হিসাবে সুবেদারী গ্রহণ না করা পর্যন্ত অস্থিরতা চলে। ঔরঙ্গজেবের শাসনকাল এবং তার পরবর্তী সময়ে সারাদেশে মোগলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। এর ফলশ্রুতি ধরেই মারাঠা হিন্দুপাদশাহীর আগ্রাসন তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে পরাজয় পর্যন্ত সমগ্র ভারতকে জ্বালিয়ে দেয়। একদিকে মারাঠা বর্গীদের লুণ্ঠন অন্য দিকে দিল্লীর মোগল বাদশাহীর টালমাটাল পরিস্থিতি তার উপরে বিদেশাগত নাদিরশাহী ও আহম্মদ শাহ আবদালির উপর্যুপরি আক্রমণ সারা ভারতের আর্থ সামাজিক পরিস্থিতিকে টালমাটাল করে দেয়। এর মধ্যে বাংলার অবস্থা কিঞ্চিৎ ভালোই ছিল। সুবা বাংলার রাজস্ব একদা ঔরঙ্গজেবকে দাক্ষিণে যুদ্ধের খরচ যোগাত। আর বাংলায় সুলভ খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্যাদি বাংলাতে বহু ইউরোপীয় বণিকদের আকর্ষিত করেছিল। বাংলা বর্গির আক্রমণের আগে পর্যন্ত তার উজ্জ্বল আর্থ সামাজিক অবস্থানে বর্তমান ছিল বর্গীর আক্রমণ। বাংলায় পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন এবং ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানদের লুণ্ঠনের ফলে বাংলা অতি দ্রুত এক দুর্ভিক্ষের রাজ্যে পরিণত হয়। দ্বৈতশাসন পরবর্তী সময়ে বাংলায় এই চূড়ান্ত ক্ষয়ের পরিণাম ছিল বঙ্গাব্দ ১১৭৬ সালের মহামন্বন্তর। এই সময়ের ছায়া তৎকালীন মঙ্গলকাব্য এবং শাক্তগীতি পদাবলীর মধ্যে গভীরভাবে রয়েছে। এর পাশাপাশি উত্থিত হচ্ছিল এক নব্য বণিক সম্প্রদায়। যারা ছিল মূলত ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মুৎসুদ্দী। এই ইংরেজমুখী নব্য বণিক সম্প্রদায়ের প্রয়োজনেই বাংলায় উনিশ শতকে নবজাগরণের সূত্রপাত হয়।

অষ্টাদশ শতকের শেষে মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহারের সূত্রপাত এর অন্যতম প্রস্তুতি পর্ব। শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে কাশীরামদাসী মহাভারতের আদিপর্ব চারখণ্ডে প্রকাশের মধ্যে দিয়ে প্রাচীনের নতুন করে পুনরুজ্জীবন শুরু হয়। নবজাগরণের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট হল প্রাচীন ধারাকে নবরূপে উন্মোচন করা। পঞ্চদশ শতকে পূর্বরোমক সাম্রাজ্যের পতনের পর প্রাচীন গ্রীসের সাহিত্য সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের বিষয়সমূহ পুনরায় ইতালির মননের সামনে উন্মুক্ত হয়ে যায়। ইতালি থেকে সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পরে সেই নবোন্মোচিত ভাবনা যা পরবর্তী সময়ে নবজাগরণ রূপে দেখা দেয়। উনিশ শতকের বাংলাতে সেই একই ধারায় চেতনার নবজন্ম হয়েছিল। আজকের আধুনিকতার সূত্রপাতও তারই হাত ধরে। বঙ্গদেশে ইংরেজ শাসকের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ইউরোপীয়

শিক্ষা সংস্কৃতির ধারাই বাংলাতে নব নব চিন্তা দর্শন ও মননের ঋদ্ধ প্রকাশের দ্বার উন্মোচন করে। ফলে দেখা দেয় নবজাগরণ। নবজাগরণের সূত্রপাতে প্রাচীনকে নবরূপে দেখতে শুরু করেছিলেন শ্রীরামপুরের মিশনারীরা। তারপর মহাভারতের ক্যালকাটা এডিশনের প্রকাশ এবং মূল মহাভারতের গদ্যানুবাদ (বিদ্যাসাগরের মহাভারতের উপক্রমনিকা ভাগ, কালীপ্রসন্নের মহাভারত) দিয়ে নবজাগরণে মহাভারতের উদ্ভব শুরু হয়। তারপর ইউরোপীয়দের অনুকরণে সৃষ্ট নাট্যমঞ্চে মহাভারতমূলক নাটকের ধারায় ভদ্রার্জুন নাটক দিয়ে সৃষ্টি হয় বহু অনুবাদ। মাইকেল মধুসূদন দত্তের লেখনী থেকে সৃষ্টি হয় মহাভারতের নানান কাব্যিক নবনির্মাণ। সে ধারায় নবীনচন্দ্র সেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সহ বহু কবি তাঁদের সৃষ্টি ধারাকে চালিয়ে নিয়ে গেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সৃষ্টি করেছেন কৃষ্ণচরিত্র যা মূলত মহাভারতীয় বিষয়ে মননশীল রচনা ধারার সূত্রপাত। এরপরেই চলে এলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বসাহিত্যের পটভূমিতে তিনি পৌঁছে দিয়েছেন মহাভারতের নবনির্মাণকে। এই ধারাতেই বিশ শতকে মন্মথ রায় থেকে মনোজ মিত্র, সুধীন দত্ত থেকে শঙ্খ ঘোষ, বুদ্ধদেব বসু থেকে নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি পর্যন্ত বহু লেখক মহাভারতের নবনির্মাণের ধারায় তাঁদের নিজস্ব চিন্তা-চেতনার আলোকে আধুনিক সাহিত্যের বিস্তার ঘটিয়ে চলেছেন।

বক্ষমান গবেষণার এই বিষয়ে চারটি অধ্যায়ের মধ্যে দিয়ে একটি যাত্রাপথকে আঁকার চেষ্টা করা হয়েছে। এর প্রথম অধ্যায়ে আমরা রেখেছি শ্রীশ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের সংস্কৃত মহাভারতের পরিচয় সংক্ষেপ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে উনিশ শতকের পূর্বসূত্র রূপে প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে মহাভারত চর্চাকে দেখানো হয়েছে। আর তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলা সাহিত্যে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে (১৮০০-১৮৫০) ও চতুর্থ অধ্যায়ে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে (১৮৫১-১৯০০) মহাভারতের নবনির্মাণের ধারা আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে।